একটি মানবিক বাংলাদেশের জন্য
ন্যুনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে
ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরি

ড. আবুল বারকাত

আমাদের চোখের সামনেই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ তলিয়ে যাচ্ছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আজ দিশেহারা। নেই জমি, নেই কাজ, নেই শিক্ষার সুযোগ, নেই একটু স্বাস্থ্য সেবা। যুব সমাজ বিপর্যস্ত। বয়োবৃদ্ধরা নিঃসঙ্গ, দিশাহীন। আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার বিলুপ্ত প্রায়। মানুষের জীবন চরম অনিরাপদ। একইসাথে কিছু দুর্বৃত্ত দেশটাকে লুটেপুটে খাচ্ছে। অস্ত্রের ঝংকার, সন্ত্রাসের বাড়-বাড়ন্ত, কালো টাকা ওয়ালাদের রাজত্ব, ঘুষ-দুর্নীতির প্রসার, রাজনীতিতে কালো টাকার দাপট, টাকা দিয়ে ভোট দখল, সংসদের কার্যকারিতা লোপ, গণকল্যাণবিমুখ শাসনব্যবস্থা– প্রগতি-বিরুদ্ধ এসবই এখন অতি স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের ফসল–৭২-এর সংবিধান– যেখানে বলা "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"– ক্ষমতাসীনরা মানছেন না। দেশ ও দেশের মানুষ তাদের কাছে যেন গরু-ছাগল তুল্য। এরই মধ্য দিয়ে পূনরুত্থান ঘটেছে '৭১-এর ঘাতকদের। সাম্প্রদায়িকতা এখন প্রকাশ্যে দাপট দেখাচ্ছে। রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হয়ে তারা মানুষ খুন করতেও কুণ্ঠা বোধ করছে না। উগ্র সশস্ত্র মৌলবাদ এখন রাষ্ট্রক্ষমতাটিই দখলের স্বপ্ন দেখছে। অশুভ এক ভবিষ্যতের দিকে এগুচ্ছে বাংলাদেশ।

দেশের এ চেহারা দেখার জন্য এক পুরুষ আগে আমরা মুক্তিসংগ্রাম করিনি। নূতন প্রজন্মের জন্য আমরা চেয়েছিলাম তারা যেন সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ মানুষ হয়। দুর্বৃত্তরা দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতিকে এমন ভাবে জিম্মি করেছে যেখানে মানুষের মানুষ হিসেবে মর্যাদা পাবার আর কোনো পথই খোলা নেই। অতএব এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের যাতে কল্যাণ নিশ্চিত হয় এমন একটি মানবিক সমাজ গড়তে হবে। এ লক্ষ্যে ব্যক্তি, গোষ্ঠি, সম্প্রদায়, রাজনৈতিক দল-সংগঠনসহ নাগরিক সমাজের সকল দেশপ্রেমিক মানুষকে ১৯৭১-এর মত মুক্তির চেতনায় আর একবার ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অর্থবহ পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটা বড় ঝাঁকুনি দরকার। নিশ্চিত করা দরকার জনগণের আকাঙ্খার জয়। কাজটি কঠিন তবে জনগণের প্রকৃত অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের মানবপ্রেম, দেশপ্রেম ও দুরদর্শিতা থাকলে তা অবশ্যই সম্ভব। সম্ভব জনকল্যাণের লক্ষ্যে হাল ধরলে ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যেই। জনগণের সচেতন-সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধ শক্তি কখনও পরাজিত হয়নি– একথা ঐতিহাসিক সত্য। দেশের স্বার্থ, আমাদের সন্তানদের স্বার্থ, ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থ বিবেচনায় রেখে একটি ন্যুনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যের বিকল্প নেই। এ মহা-উদ্যোগে নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন জরুরি:

১. চাল-ডাল-আটা-পিয়াজ-লবন-তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের মূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে হবে।

২. দেশের প্রতিটি কর্মক্ষম মানুষের জন্য প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে নূতন কলকারখানা স্থাপন (বন্ধ হওয়া কারখানা খুলে দেয়াসহ), গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ গ্রহণ, কৃষিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার নিশ্চিত করতে হবে। মানুষের স্ব-কর্মসংস্থানের উদ্যোগকে রাষ্ট্রিয়ভাবে উৎসাহিত করতে হবে।

৩. বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য বাৎসরিক মোট কর্মদিবসের এক-তৃতীয়াংশ সময়– অর্থাৎ বছরে কমপক্ষে ১০০ দিনের কর্মসংস্থান-এর ব্যবস্থা করতে হবে ।

৪. দেশের প্রত্যেকের জন্য সার্বজনীন-গণমুখী-বিজ্ঞানমনস্ক সর্বোচ্চ মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রের দায়িত্বে নিশ্চিত করতে হবে সকলের জন্য বিনামূল্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ। পরিকল্পিতভাবে সম্ভাব্য অতি স্বল্প সময়েই দূর করতে হবে নিরক্ষরতা।

৫. সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির ১০০ ভাগ গ্যারান্টি দিতে হবে। রাষ্ট্রিয়ভাবে স্বাস্থ্য খাতকে অর্থনৈতিক- উৎপাদনশীল খাত হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

৬. নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন-সংশ্লিষ্ট সকল উদ্যোগকে– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, উত্তরাধিকার, ঋণপ্রাপ্তি, পেশা নির্বাচন, নির্বাচিত জন প্রতিনিধি হওয়া– যথাযোগ্য গুরুত্ব দিতে হবে।

৭. খাস জমি-জলা-বনভূমিসহ সকল রাষ্ট্রিয় সম্পদে দরিদ্র নারী-পুরুষের হিস্যা নিশ্চিত করতে হবে। যেমন ১ কোটি বিঘা চিহ্নিত খাস জলা-জমি প্রকৃত দরিদ্র কৃষকের মধ্যে বণ্টন করা; শহরাঞ্চলের খাস জমিতে বস্তিবাসী ও স্বল্প-আয়ের মানুষের আবাসন ব্যবস্থা করা; রিকশা-ঠেলাগাড়ী-ভ্যানচালকদের নির্বিঘ্ন চলাচল আইনগতভাবে নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

৮. ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষ (প্রায় দেড় কোটি), ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আদিবাসী মানুষ (প্রায় ২০ লাখ), এবং নিম্নবর্ণ-দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ (প্রায় ১৫-২০ লাখ)-এর মানবাধিকার সর্বোচ্চ মাত্রায় পদদলিত। তাদের এ চিরস্থায়ী বিপন্নাবস্থা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে নির্মূলের লক্ষ্যে রাষ্ট্রিয় উদ্যোগে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৯. প্রতিটি প্রতিবন্ধি মানুষের (১ কোটি ৩০ লক্ষ) মানুষ হিসেবে পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রিয় ও সামাজিক উদ্যোগ নিতে হবে।

১০. দেশের সকল বয়োবৃদ্ধদের (যাদের বয়স ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে– সংখ্যা এখন ৭০ লাখ) অবশিষ্ট জীবন সুন্দরভাবে অতিবাহিত করার সকল দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে (বয়োবৃদ্ধের অধিকাংশই নিঃসঙ্গ, শারীরিকভাবে ভঙ্গুর, এবং বর্ধিত পরিবার কাঠামো ভেঙ্গে যাবার কারণে নিরাপত্তাহীন)

১১. জনকল্যাণমুখী খাতে রাষ্ট্রিয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। সে ক্ষেত্রে অনুৎপাদনশীল এবং/অথবা জনকল্যাণ বিমুখ খাতসমূহে রাষ্ট্রিয় বরাদ্দ তুলনামূলক হ্রাস করতে হবে।

১২. বিদেশের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার বিস্তৃতি ঘটাতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৩. "আইনের চোখে সবাই সমান"– এ নীতির ভিত্তিতে দেশে সুস্থ আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে ব্যক্তি, গোষ্ঠি, সমষ্টি পর্যায়ে ভয়-ভীতিহীন নিরাপদ জীবন।

১৪. কালো টাকা, পেশী শক্তি ও জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেউ যেন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হতে না পারেন তা আইন করে বন্ধ করতে হবে। সৎ, যোগ্য, দেশপ্রেমিক মানুষেরা যেন নির্বাচনী রাজনীতিতে ফিরে আসতে পারেন সে পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে নাগরিক সমাজের নির্ভীক ও অগ্রণী ভূমিকা পালনের সকল সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে; সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।

১৫. উগ্র সশস্ত্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠির রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। ধর্মের পবিত্রতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পবিত্র ধর্মকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে হবে।

১৬. রাষ্ট্র পরিচালনে জনগণের অধিকতর কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, জনগণের স্বাধীন মত ও ইচ্ছা লালন ও প্রকাশের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা, এবং ক্ষমতায়ন-এর লক্ষ্যে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ (আর্থিক ক্ষমতাসহ) নিশ্চিত করতে হবে।

১৭. জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকরী গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে– অন্যান্যের মধ্যে– রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী বিষয়ে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য দিয়ে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১৮. নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ স্বাধীনতা– আর্থিক, প্রশাসনিক, আইনগত– নিশ্চিত করতে হবে।

১৯. বিচার বিভাগকে সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করতে হবে।

২০. দুর্নীতি দমন কমিশনকে প্রকৃতই স্বাধীন করতে হবে।

২১. বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমশক্তি (দক্ষতা বৃদ্ধির চাহিদাপূরণসহ), বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী যারা দেশের অর্থনীতি ও প্রযুক্তিগত ভিত শক্ত করতে অবদান রাখছেন এবং/অথবা রাখতে সক্ষম তাদের রাষ্ট্রিয় স্বীকৃতি দিতে হবে।

প্রস্তাবিত ন্যূনতম কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন যোগ্য – বাস্তবসম্মত ও সংবিধান সম্মত। এ কর্মসূচি প্রণয়নে ধরে নেয়া হয়েছে যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নয়ন হতে হবে মানব কল্যাণমুখী (তথাকথিত বাজার অন্ধত্বমুখী নয়)– মুক্তি ও স্বাধীনতার চেতনায় উদ্ভাসিত; হতে হবে এ উন্নয়ন “দেশের মাটি হতে উত্থিত” (বাইরের ধার করা তত্ত্বকথা নয়)। ন্যূনতম অভিন্ন এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এ দেশের মানুষের জন্য কাঙ্খিত এক অর্থপূর্ণ পরিবর্তনের পূর্বশর্ত মাত্র। প্রস্তাবিত কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হলে আস্তে আস্তে এমন এক সময় আসবে যখন এ দেশের মানুষ আর জন্মসূত্রে দরিদ্র থাকবে না– সেটাই হবে দূর লক্ষ্য। পরিবর্তন হবে ধীরে ধীরে; প্রস্তাবিত কর্মসূচির সবকটি একলাফে বাস্তবে রূপ নেবে না– কোনটা দ্রুত হবে, আবার কোনটা হবে তুলনামূলক ধীরে। সাফল্যের গতি প্রকৃতি নির্ভর করবে এক দিকে যেমন আমরা কোন গতিতে এগুতে চাই তার উপর, আর অন্যদিকে নির্দিষ্ট কর্মসূচির প্রকৃতির উপর। তবে সবার আগে নিশ্চিত করতে হবে এ দেশের আপামর মানুষের কর্মসূচিটি ধারণ করা। প্রস্তাবিত ন্যূনতম কর্মসূচি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে না। আন্দোলনে রূপ দিতে হবে– দেশের সকল দেশপ্রেমিক মানুষের স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনে। এ আন্দোলন হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এদেশ বাসযোগ্য করার আন্দোলন। দেশের অর্থপূর্ণ পরিবর্তন নিশ্চিত করার এ আন্দোলনে দুর্বৃত্তায়নের শিকার– এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অংশগ্রহণ জরুরি। নূতন স্বপ্নের “২১ দফার ন্যূনতম কর্মসূচি” গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্রুতগতিতে অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া আমাদের মাতৃভূমি- বাংলাদেশকে রক্ষা করা সম্ভব। মুক্তি ও স্বাধীনতা চেতনায় উদ্ভাসিত আলোকিত মানুষের ঐক্যই পারে ন্যূনতম কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি মানবিক বাংলাদেশ গড়তে।